অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি সম্বন্ধে

অপর্ণা হাওলাদার, পিএইচডি
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি
চাথাম বিশ্ববিদ্যালয়
পীটসবার্গ, ইউএসএ
2022

বাংলাদেশে বসবাসরত আন্ডারগ্র্যাড শিক্ষার্থীদের জন্য লিখতে চাচ্ছি। আমাদের বেশিরভাগের জন্যই বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য আসার ব্যাপারটা আন্ডারগ্র্যাডে থাকতে পরিষ্কার না। এটা ক্যারিয়ার হিসেবে কতটা উপযোগী, আমার পারসোনালিটির সাথে গবেষণাভিত্তিক ক্যারিয়ার কতটা যায়, এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট তথ্য এবং মেন্টরিং এর সুযোগ পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। আমি চেষ্টা করবো আমার সাধ্যমত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্য তুলে ধরতে, এবং এই পার্থক্যের ভিত্তিতে কিভাবে নিজেকে দেশে থাকতে তৈরি করা দরকার, সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে। আমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থনীতি, কাজের ক্ষেত্র এনভায়রনমেন্ট এবং এগ্রিকালচার মূলত, অনেকটাই অর্থনৈতিক ইতিহাস ভিত্তিও। আমার ফান্ডিং এর কাজগুলো ইন্টারডিসিপ্লিনারি ছিলো। এইসবের ভিত্তিতে আমার এক্সপেরিয়েন্সে নর্থ আমেরিকার সিস্টেম তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা এবং উন্নত বিশ্বের উচ্চশিক্ষার সিস্টেমের মূল পার্থক্য কি? এই পার্থক্য আসলে উচ্চশিক্ষার আগেই ফান্ডামেন্টাল কিছু জায়গায় তৈরি হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, স্কুলে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রস্তুতি নিতে হোতো, রেজাল্ট ভালো করতে। কিন্তু পুরো প্রস্তুতিটাই প্রায় শতভাগ মুখস্থভিত্তিক। এই প্রস্তুতির মধ্যে থেকে যাওয়ার পরে কি কারো পক্ষে সৃজনশীল হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব? দেশের বাইরে বিশেষত উন্নত বিশ্বের সাথে এটাই পার্থক্য। এখানে "গিলিয়ে" দেওয়া শিক্ষা ব্যবস্থা না। সুতরাং হয়তো দেশে থেকে যারা বাইরে পড়ার প্রস্তুতি নিতে চাইছে, তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে "মুখস্থ"বিদ্যার কাছে সপে না দেওয়া। খুঁজে খুঁজে বের করা কোথায় কি করলে নিজের প্রশ্ন করার ক্ষমতা নষ্ট হবে না। গবেষণাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চাইলে এটাই হয়তো প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব।

আন্ডারগ্র্যাডে আরও কিছু সিস্টেমের পার্থক্যের কারণে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি হোলো - মেজর। আমাদের সাবজেক্ট কি হবে এটা ভর্তির সময় ভাইভা বোর্ডে ঠিক হয়ে যায় যখন আমাদের বয়স ১৮ বা ১৯, এবং সেই সাবজেক্টে আমাদের পড়াশোনার কোনো ইচ্ছা আছে কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না। এমনকি অন্য বিভাগে ক্লাস করাও যায় না। যেকারণে, আমার মত অর্থনীতির ছাত্রদের ম্যাথ বা সট্যাট ক্লাস নিজের বিভাগে যা সম্ভব, সেটুকুই করতে হয়। এইসব কারণে রিয়েল এনালাইসিস বা প্রোবাবিলিটির বেসিক অনেক গোলমাল থাকে। বাইরের ছেলেমেয়ে যারা পাঁচটা ম্যাথ ক্লাস বা পাঁচটা স্ট্যাট ক্লাস করে এসেছে, তাদের সাথে এরপর প্রতিযোগিতা করতে হয় গ্র্যাজুয়েট সকুলে। এরপরের বিশাল সমস্যাটা হচ্ছে আবারো মুখস্থবিদ্যা ভিত্তিক পরীক্ষা সিস্টেম থেকে। আমাদের মোটামুটি সিলেবাসে যা পড়ানো হয় তার বাইরে এনালিটিক্যাল প্রশ্ন আসে না। প্রশ্নপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার কারণে আমাদের "সলভিং" জাতীয় প্রশ্নে হোঁচট খেতে হয়। ক্লাসভিত্তিক পড়াশোনায় বাংলাদেশে আরেকটি বড় সমস্যা হোলো প্রশ্ন করাকে এনকারেজ না করা। বাংলাদেশে শিশু থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ক্লাসে প্রশ্ন করাকে এমনকি অনেক শিক্ষক "বেয়াদবি" হিসেবেও দেখেন।
মেন্টর-এডভাইজার বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আমলে অন্তত কিছু ছিলো না তেমন।

আরেকটি বড় ঘাটতির জায়গা হোলো রিসার্চ। ইদানীং বাংলাদেশে বেশ কিছু রিসার্চ অর্গানাইজেশনের জব এডভার্টাইজিং দেখি অনলাইনে, হয়তো অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। রিসার্চের সাথে এক্সপোজারের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নামকরা জার্নাল, পেপার এসবের সাথে পরিচিত হতে শুরু করা। আমাদের জার্নাল এক্সেসও থাকে না অনেক সময়ই। এরপর ফিল্ড অনুযায়ী যেসব মেথড শেখা দরকার তা শুরু করা - যেমন অর্থনীতিতে স্ট্যাটা, আর, পাইথন, রিমোট সেন্সিং এর চল বেশি। আবার অন্য জায়গায় এসপিএসএস চলে। এই সফটওয়্যার সম্বন্ধে জানা, এবং কিছুটা প্রোগ্রামিং শেখা। একটা পেপার কিভাবে লিখতে হবে, রেফারেন্সগুলো কেমন হবে। টেবিল, গ্রাফ কিভাবে তৈরি করতে হবে, এই ধারণাগুলো থাকলে অনেক সময় বাঁচানো সম্ভব। এসব স্কিলের বাইরে আরেকটি বড় স্কিল হোলো - পিওপল ম্যানেজমেন্ট স্কিল। কোলাবরেশনের যুগে বড় গ্রুপে নেইভ মানুষ হয়ে ঢুকলে উন্নতির অনেক রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশাসনিক জায়গায় শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির কারণে অনেক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের হলের রুম, থাকাখাওয়ার মান উন্নত বিশ্ব তো দূরের কথা, অনেক অনুন্নত বিশ্বেরও ধারেকাছে নেই। এই কথাগুলো নিয়ে আসলে আমার লেখার কিছু নেই, আমি কেবলমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল জায়গা থেকে একজন ছাত্র এই সিস্টেমের মধ্যেও কিছুটা নিজেকে তৈরি করতে পারে কিনা - সেটা বোঝার চেষ্টা করছি।

মূলত এটা আমার এক্সপেরিয়েন্সে “I wish I had known when I was in my undergrad” পোস্ট। বাংলাদেশের বাস্তবতায় আমাদের সাধ্য এবং সামর্থ্যের মধ্যেই কথা বলার চেষ্টা করবো। আগের পর্ব থেকে তো বুঝতে পারছি আমাদের ঘাটতির কেন্দ্রগুলো কি কিঃ কোর্স, মেথড/স্কিল, রিসার্চ, নেটওয়ার্কিং। আর এর উপর বাড়তি বাংলার নারীসুলভ ভীতির কারণে উদ্যোগী না হওয়া তো আছেই। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ক্যাটাগরিতে যাওয়ার আগে বলে নেই, আমার মতে, আমাদের সবার নিজের বাস্তবতায় নিজের জীবনকে/ক্যারিয়ারকে গুছিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিজেই নিতে হবে। আর কেউ কাজ করে দেবে না, নিজে উদ্যোগী না হলে আমরা যেখান থেকেই শুরু করি না কেন, সেখানেই আটকে থাকবো।

কোর্সঃ এই ব্যাপারটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আমি ঢাবিতে থাকতে কঠিন যত কোর্স নেওয়া সম্ভব ছিলো ডিপার্টমেন্টে, তার সবই নিয়েছিলাম। এবং, বাইরে এসে আবিষ্কার করি, অন্য সবার থেকে কত পিছিয়ে আছি। সব কাভার দিতে না পারলেও, কিছু জিনিস দেশে বসে কাভার দিতে পারা উচিত। এর জন্য জানা প্রয়োজন স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা দেশের বাইরে একই সাবজেক্টে কেমন হচ্ছে। আমাদের শিক্ষকেরা অর্ধেক সিলেবাস ইগনোর করে যান, প্রশ্ন ভ্যারিয়েশন বলতে থাকে না কিছু। কিন্তু টেক্সটবুক হাতের কাছে থাকলে, পুরোটা পড়তে তো সমস্যা নাই কেউ পড়াক বা না পড়াক। এখন ইউটিউবে বাইরের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার পাওয়া যায়। এর বাইরে অনেক শিক্ষক নিজের ওয়েবসাইটে বিষয়ভেদে লেকচার, প্রশ্ন তুলে দেন। এখানে লেকচার দেখাটাই শেষ কথা না, কারণ এটা সবাই করতে পারে। কাজ হোলো বের করে দেখা এইসব প্রশ্ন (টেক্সটবুকের স্যামপল অথবা শিক্ষকদের ওয়েবসাইটে পাওয়া ইত্যাদি) সল্ভ করতে পারছি কীনা। টিউটরদের কাছে পড়ে পড়ে, আমাদের ব্রেইনের অনেক অংশ জং ধরে যায়। এখান থেকে বের হতে প্রশ্ন সলভের বিকল্প নেই। ধরুন আপনি, ইন্টারমিডিয়েট মাইক্রোইকনমিক্সের ক্লাস নিচ্ছেন। তাহলে, মূল বই যতদূর সম্ভব ভ্যারিয়েনই পড়ানো হচ্ছে। এই বই এর কিন্তু এক্সারসাইজ বলে আলাদা বইই আছে। অনেক মাইক্রো-ম্যাক্রো বই এরই এমন এক্সারসাইজ বলে আলাদা বই থাকে। নীলক্ষেতেও পুরোনো বই এর দোকান খুঁজলে পাওয়া যায়। আপনি নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইলে এই বাড়তি পরিশ্রমটুকু সিস্টেমের অংশ করে ফেলা উপকারি হবে। এই ব্যাপারে আপনার ডিপার্টমেন্টে সদ্য বাইরে থেকে আসা প্রফেসররা হতে পারেন বিশেষভাবে রিসোর্সফুল। তাদের কাছে যান, কথা বলুন, কি করা প্রয়োজন জিজ্ঞেস করুন।

প্রশ্ন সলভিং এর পরে বিশাল গ্যাপ হচ্ছে প্রোগ্রামিং। আমরা তো অনেকেই স্যোশাল সায়েন্সে গিয়েছিই এইসব এড়িয়ে যেতে, তাই না? আজকের দুনিয়ায় স্যোশাল সায়েন্সের একটা বিশাল অংশ হচ্ছে এমপিরিক্যাল কাজ। এবং, হঠাত করে বাইরে এসে সব একত্রে শেখার চেয়ে একটু একটু আগে শিখে রাখা অনেক কাজের হবে। স্ট্যাটা থেকে কাজ শেখা শুরু করা যায়। এরপর প্রোগ্রামিং ধরে এগোলে কিছু আর, পাইথন শুরু করা যায়। এসবের অনেক টিউটোরিয়াল আজকাল অনলাইনে ফ্রি পাওয়া যায়। আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, আপনার লাইনে কি ধরণের মেথড/স্কিল প্রয়োজন, এবং সেটা খুঁজে বের করে শেখা শুরু করা। ফিল্ডভেদে এই স্কিল লেভেলও ভিন্ন হয়। যেমন, স্যোশাল সায়েন্সের অনেক ফিল্ডে এথনোগ্রাফিক কাজ শিখতে হয়। সার্ভে করা শিখতে হয়। আপনার ফিল্ডে কি জরুরি, সেটা জেনে বের করে সেই অনুযায়ী প্ল্যান করতে হবে। অনেক জার্নাল এখন ডাটা এবং কোড ফ্রি দিয়ে দেয়, এখান থেকে রিসোর্স নিতে পারেন। আপনার বন্ধুদের মধ্যে যারা প্রোগ্রামিং এর লাইনে আছে, তাদের কাছে জানতে চান কি করতে হবে, কিভাবে শুরু করা যায়। গ্রুপ করে নিজেরা মিলে শেখা শুরু করুন।

রিসার্চঃ রিসার্চের কাজের সাথে যতটা সম্ভব পরিচিত হওয়া। তারচেয়েও বড় কথা বোঝার চেষ্টা করা রিসার্চ আমার ভালো লাগছে কীনা। রিসার্চকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে হলে প্রচণ্ড প্যাশেন্ট মানুষ হতে হয়। পাঁচ/দশ বছর লাগিয়ে কিছু করার ধৈর্য সবার থাকে না, থাকতে হবে এমন কথাও নেই। কিন্তু যদি না থাকে, তাহলে এই লাইনে কাজ শুরু করলে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে পড়তে হতে পারে।

কিভাবে বুঝবেন ভালো লাগে কীনা? একটা বড় জিনিস হচ্ছে, “জানতে” ভালো লাগে কীনা। ধরুন, আমরা যেহেতু স্যোশাল সায়েন্সের কথা বলছি - দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে, বিভিন্ন মত - থিওরি জানতে কি আগ্রহ বোধ করছেন। তর্ক করতে এইসব বিষয়ে আগ্রহ বোধ করছেন? নীলক্ষেতে হাঁটার পথে হঠাত ইতিহাসের একটা বই দেখে কি আটকে যাচ্ছেন? বের করুন আপনার ক্যাম্পাসে অন্য কারা প্রবন্ধ/সাহিত্য চর্চা করে, এদের অনেকেই পত্রিকা, লিটল ম্যাগ বের করে। এইসব পত্রিকার সাথে কাজ করলে গবেষণার প্রতি আগ্রহ আসলেই পাচ্ছেন কীনা বুঝতে সাহায্য করতে পারে। ঢাকায় “হালখাতা” নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক আমাকে প্রতি তিন মাসে একটা এমন লিখতে দিতেন। আমি ঐ পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যায় সবচেয়ে জুনিয়র লেখক ছিলাম অনার্স পড়াকালীন সময়ে। লেখার বিষয়গুলো সব সামাজিক-রাজনৈতিক ছিলো। এই কাজগুলোর মাধ্যমে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ তৈরি করে নিলে লং-টার্মে অনেক কাজে লাগতে পারে।

আপনার ফিল্ডে বড় কাজ কারা করছেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চার কারা? তাদের কাজ, পেপার-বই এসব যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করুন। আপনার ফিল্ডের বাইরে যারা একই বিষয়ে কাজ করেন, তাদেরটাও জানার চেষ্টা করুন। যেমন, আপনি অর্থনীতিতে পড়লে স্যোশিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স এগুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করুন। ইতিহাস বলতে কিছু আমাদের অর্থনীতি বিভাগে শেখানো হয় না, অথচ ইতিহাসকে বাদ দিলে অর্থনীতি চর্চাই করা সম্ভব না (well, I work on economic history, might be biased!)। আপনার ফিল্ডের লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করুন, সেমিনার - ওয়ার্কশপ আশেপাশে কিছু হলে এটেন্ড করুন। কারো কাজ ভালো লাগলে বোঝার চেষ্টা করুন, কেন ভালো লাগছে। এই কাজের এক্সটেনশন কি হতে পারে?

আপনি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে কাজ শুরু করলে প্রথম এক বছর শুধু সিলেবাস থাকবে। তার পর জ্ঞানের মহাসমুদ্রে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হবে, নিজের রিসার্চ প্রশ্ন খুঁজে বের করে আনতে। আপনি আজকে যত বেশি পড়বেন, জানবেন, ওপেন চিন্তা করতে - নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে তৈরি থাকবেন, ততই ভালো রিসার্চের বিষয় খুঁজে বের

করতে পারবেন। এটা একটা প্র্যাকটিস, নিজেকে সিস্টেমে রেখে চিন্তা করতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানে কাজ করার সুবিধা হোলো, অনেক প্রশ্ন আমাদের আশেপাশেই পড়ে আছে - শুধু দৃষ্টিশক্তি তৈরি হলেই দেখা সম্ভব। আর এইজন্য প্রয়োজন প্রতিনিয়ত নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া। আপনি যখন একটা থিওরি পড়ছেন, ভাবার চেষ্টা করুন আশেপাশের কোন এক্সামপলগুলো দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন ধরুন, আপনি থিওরি পড়লেন মার্কেট রিলেটেড - যা পড়ছেন, তা দিয়ে বাংলাদেশের কাঁচাবাজারকে কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন? এটাই চ্যালেঞ্জ। চোখকান খোলা রাখুন, এলার্ট থাকুন। একটা নোটবুক রাখুন প্রথম থেকেই যেখানে আইডিয়া লিখে রাখা যাবে।

রিসার্চ নিয়ে পরবর্তী কাজ হোলো, সেকেন্ড ইয়ার/থার্ড ইয়ার থেকে আশেপাশে দেখা কোথাও এসিস্টেন্ট হিসেবে বা ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করা যায় কিনা। বাংলাদেশ থেকে কানাডা আসার আগে আমি দুই জায়গায় কয়েক মাস করে কাজ করেছিলাম, এই কাজের মাধ্যমে আপনার কিছু এক্সপেরিয়েন্স হবে, যেটা প্রথমত সিভিতেও জরুরি। আবার, পরে নিজের রিসার্চ শুরু করার সময়ও জরুরি। চেষ্টা করুন, এমন কারো সাথে কাজ করতে যে আসলেই স্কলার। আপনাকে গাইড করতে সমর্থ।

নেটওয়ার্কিংঃ নেটওয়ার্কিংকে বাংলাদেশে খুব বাজে ভাষায় ডাকা হয়। যেমন, শেয়ারমার্কেটের ব্রোকারকে বাংলাদেশে অনেকে বলে “দালাল” তেমনি। এটা আমাদের সমাজের হীনমন্যতা, নলেজ-বিমুখীতা। একজন ছাত্র হিসেবে আপনার অধিকার এবং দায়িত্ব আপনার জন্য সঠিক মেন্টর খুঁজে বের করা। কার সাথে কথা বললে সে আপনাকে গাইড করতে পারবে? দেশের ভেতরে বা বাইরে কার কার এচিভমেন্ট আপনাকে প্রেরণা দেয়? এদের কাছে কোল্ড ইমেইল করুন, প্রফেশনাল - টু দি পয়েন্ট। আপনি কে, কি করছেন, কেন ইমেইল করছেন। আমি ফেসবুকে নক দেওয়াকে আনপ্রফেশনাল মনে করি পারসোনালি, কারণ আপনার চেয়ে এরা বেশ সিনিয়র, এবং এদের সাথে আপনার পারসোনাল সম্পর্ক না। দরকার হলে নক করে ইমেইল আইডি নিয়ে তারপর ইমেইল করুন। আপনি যা ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কারা সিরিয়াসলি কাজ করছেন, কাদের কাছে শিখতে পারছেন - তাদের সাথে কথা বলুন। অফিস আওয়ারে যান, দেখা করুন, আপনি কি করতে চান - এদের জানান। সাজেশন চান। অনেকে নেগেটিভ কথা বলতেও পারে, কিন্তু এই ব্লগের শুরুতেই যেমন বলেছি, আমাদের দায়িত্ব নিতে জানতে হবে। আর তার মানে হচ্ছে অন্যের কথায় নিরুৎসাহিত না হওয়া।

সিনিয়রদের সাথে নেটওয়ার্কিং এর সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোলো সমবয়সীদের সাথে নেটওয়ার্কিং। অনেকসময় মনে হতে পারে যে আশেপাশের সবাই সারাদিন স্থূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, আমি কিছু শিখছি না। এখানেও আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। খুঁজে বের করুন, আপনার ক্যাম্পাসে অন্য কারা আছে পড়াশোনা করতে আগ্রহী, জানতে আগ্রহী। পত্রিকা বের করছে যারা, ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য যারা, এরা সাধারণত এলার্ট থাকে। আপনার নিজের মত করে এম্বিশাস বন্ধু খুঁজে বের করুন, যারা নিজেরা গণ্ডীর বাইরে চিন্তা করতে চায়। এমন মানুষ অনেক আছে আশেপাশে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে কিছু এরকম বন্ধু পেয়েছিলাম (আমি ভাগ্যবান ছিলাম), যাদের মাধ্যমে বিশ্বের বড় বড় কিছু লেখক - গবেষক সম্বন্ধে জেনেছিলাম।

বাইরে আসার জন্য অনার্স বা মাস্টার্সের পর কি কি কাগুজে প্রস্তুতি নিতে হয়, কিভাবে নিতে হয় - তার উপর অনেকগুলো হায়ার স্টাডিজ রিলেটেড ফেসবুক গ্রুপ আছে। বাইরে এসে পড়াশোনার প্রস্তুতি নিতে চাইলে এইসব গ্রুপে আন্ডারগ্র্যাড থার্ড ইয়ার/ফোর্থ ইয়ার থেকে জয়েন করে থাকা ভালো। দেশভেদে পরীক্ষা জিআরই, টোফেল, আইএলটিএস এর কোনো একটি বা দুইটি হতে হয়। এইসব পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে আমার হিসেবে ৪/৫ মাস সময় লাগে। প্রিপারেশন কিভাবে নিতে হবে, তা এইসব গ্রুপ থেকে ডিটেইলস জানা যাবে। বাংলাদেশের অনেক অধ্যাপক রেফারেন্স লেটার দিতে খুব ঝামেলা করেন, সুতরাং রেফারেন্স লেটারের জন্য আগে থেকে প্ল্যান করে

রাখা ভালো। অর্থনীতির গ্র্যাজুয়েট স্কুলগুলো ফল সেমিস্টারে শুরু হয়, এর জন্য এপ্লিকেশন ডেডলাইন থাকে অক্টোবর-জানুয়ারি এর মধ্যে কোনো সময়। ক্রেডিট কার্ড এর এক্সেস লাগবে এপ্লাই করতে। প্রতিটি স্কুলে সব মিলিয়ে আপনার ১০,০০০ এর মত খরচ হতে পারে, আর জিআরই টোফেল সব মিলিয়ে ৪০,০০০ এর দিকে খরচ হতে পারে। সুতরাং, পুরো প্রসেসটা বেশ এক্সপেন্সিভ। কত লাগবে, কখন লাগবে এই হিসেবগুলো মাথায় রাখা জরুরি। আগে থেকে নিজেই কিছু সেইভ শুরু করে রাখাও ভালো। আমি প্রিপারেশন নিয়ে তেমন কিছু বলছি না। কারণ, এর উপর অনেক কথা ফেসবুকে, ইউটিউবে আছে।

আমি বরং দেশ ছাড়ার আগে পারসোনাল কিছু প্রিপারেশনের কথা বলতে চাই, কারণ সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে সব কিছুর চাপ সামলাতে না পেরে অনেক গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টই ডিপ্রেশনে চলে যায়।
প্রথমত, দেশের স্কুল-কলেজে অনেক প্রেশারের মধ্যে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পড়াশোনার সারাবছর চাপ খুব কমই থাকে। সেখানে থেকে বাইরে এসে হঠাত দিবারাত্র কাজের চাপ সহ্য করা কঠিন। এর জন্য কিছু মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে আসা ভালো। সামারে দেশে থাকা অবস্থাতেই ইমেইল করুন আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, সেখানকার সিনিয়র স্টুডেন্টদের। জানতে চান, কোন কোন টেক্সটবই লাগতে পারে। সিলেবাস পাওয়া সম্ভব কিনা। আপনি যদি এভাবে কিছুটা আগে থেকে গুছিয়ে রাখেন, তাহলে গিয়ে অথৈ সাগরে পড়বেন না। অন্তত আপনার প্ল্যান থাকবে কি কি করা লাগবে।
দ্বিতীয়ত, দেশে আমরা যারা বাবা-মা এর সাথে থেকে হঠাত বাইরে চলে আসি, অনেকেই নিজের ফাইন্যান্স, নিজের খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় ইত্যাদির হিসেব জানি না। এগুলো অভ্যাসের ব্যাপার, কঠিনও না; কিন্তু একেবারেই অভ্যাসে না থাকলে পড়াশোনার চাপের পাশে এত মেইনটেইন করা কঠিন হয়ে যায়। আপনি কিছু প্ল্যান করে আসুন, যেমন ব্রেকফাস্ট - লাঞ্চ - ডিনারে আপনার নিজের শরীর অনুযায়ী কি কি দরকার হয়। আপনি ১০ টা আপনার চলে এমন রেসিপি শিখে আসুন। প্রয়োজনে বাজারে গিয়ে অভ্যাস করুন, যাতে এসে একবার গ্রোসারিতে অনেক সময় না চলে যায়। আমার নিজের ক্ষেত্রে লিস্ট ধরে গ্রোসারি করা, প্ল্যান করে রান্না করা, আগে থেকেই এক সপ্তাহে কি কি খাবো ঠিক করে রাখা - এগুলো অনেক সাহায্য করেছে (এগুলো সব ঠেকে ধীরে ধীরে বোঝা কোন সিস্টেম ভালো)। লন্ড্রি মেশিন বাসাতেই থাকার কথা, অনেকের পাবলিক লন্ড্রিতে যেতে হতে পারে। সেটা উইকএন্ডে ব্যবস্থা করে রাখা ভালো।

মোটকথা, পড়াশোনার বাইরের অন্যান্য রেগুলার কাজগুলোকে সিস্টেমে এনে ফেললে আপনার সময় কম নষ্ট হবে। এইসব দেশে বাইরের খাবার অনেক দামি, আপনি যদি বাইরে খেতে চান প্রথম দিকে - সেটা খারাপ মানের খাবার হয়ে যেতে পারে। তাই, নিজে এই সিস্টেম ঠিক করে রাখা এবং নতুন জিনিসে ওপেন থাকা জরুরি। যেমন, আমি কাজের চাপের মধ্যে বাঙালি রান্না বাদ দিয়ে চাইনিজ স্যুপ, ন্যুডলস এগুলো বেশি করি। এতে আমার ১০/১৫ মিনিটের বেশি লাগে না। প্রথম কয়েক মাস ফাইন্যান্সিয়ালি আপনার খুব "টাইট" লাগতে পারে। ধীরে ধীরে সব সিস্টেমে এসে যাবে। নর্থ আমেরিকায় গ্রোসারিতে ভালো মানের খাবার আপনি বেশ এফোর্ড করতে পারবেন।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশি অনেকেই দেশের বাইরে এসে কেবল দেশি কমিউনিটি খুঁজে বেড়ায়। আমি তাদের সমালোচনা করছি না, এটা পারসোনাল চয়েস। কিন্তু আপনি যদি গ্রো করতে চান, আমার কাছে অন্য দেশের মানুষ দেখা, তাদের কালচার সম্বন্ধে জানা, শেখা এগুলো খুব জরুরি মনে হয়। হঠাত কোনো মানুষের সাথে কি কথা বলবেন, এই নিয়ে বই আছে অনেক। তবে একাডেমিয়াতে একটা সাধারণ কথা হচ্ছে, মানুষ সবসময় তার রিসার্চ নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন, সে এখন কি নিয়ে কাজ করছে, মানুষ নিজেই অনেক ডিটেইলস শুরু করে দেবে। আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়া, ঢাবিতে পড়া; দেশের বাইরে এসে অনেক আনকমফোর্টেবল লাগতো, এক্সেন্ট ভাষা এইসব নিয়ে। কিন্তু আপনি যত বেশি কথা বলবেন, তত

শিখবেন কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয়। দেশী পার্টিগুলোতে যে স্কিল আপনার তৈরি হবে না। আপনি আপনার সহনক্ষমতা অনুযায়ী নিজের কমিউনিটি তৈরি করুন।

ফোর্থ, একাডেমিয়ার সাথে আপনার প্রথম সংযোগ তৈরি হয় আপনার ক্লাসমেট আর কোর্স টিচার, টিএ এদের মাধ্যমে। যত বেশি পারুন, নিজেকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করুন। আপনি এম্প্যাথেটিক, সেনসিটিভ, হেল্পফুল হলে মানুষ আপনাকে এমনিতেই গ্রহণ করবে। কমিউনিটির কাজ - যেমন, সেমিনার এটেন্ড করা, ফ্রাইডে গ্যাদারিং এ যাওয়া, ক্লাসমেটদের সাথে আউটিং এ যাওয়া - এগুলো এটেন্ড করুন। হোমওয়ার্ক গ্রুপ বেঁধে সবার সাথে করার চেষ্টা করুন। ক্লাসে অন্য অনেকে আপনার চেয়ে অনেক স্কিল্ড থাকতেই পারে, এদের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করে আমাদের তো আর দিন যাবে না। বরং, দেশে থাকতে আপনি কি জানতেন এবং বাইরে আসার পর প্রতিদিন কতটা শিখছেন, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। ডিপ্রেসনের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, নিজেকে আলাদা করে নেওয়া। এটা করা থেকে বিরত রাখুন নিজেকে। মানুষের সাহায্য চান, দরকার হলে ক্যাম্পাস থেরাপিস্টের কাছে যান। নিজেকে আইসোলেটেড করে ফেললে অনেক অসুবিধা হবে।

বাংলাদেশের মানুষের একটা কমন সমস্যা হচ্ছে নিজের কথা বলতেই থাকা (নিজের জীবন নিয়ে নালিশ করতেই থাকা-বাংলায় ঘ্যানরঘ্যানর বলা যেতে পারে)। এইসব পারসোনালিটি সমস্যা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত আমাদের। আপনার শেখার আগ্রহ আছে - এই কথা প্রফেসরদের দৃষ্টিতেও আসা প্রয়োজন। অফিস আওয়ারে যাওয়া, ক্লাসে ডিসকাশনে অংশ নেওয়া ইত্যাদি অনেক হেল্পফুল। বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলো অনেক রিসোর্সফুল। আপনি সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কিংবা সন্ধ্যায় অফিসে থেকে অন্য গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের সাথে আড্ডাতেই অনেক কিছু শিখবেন। মাস্টার্স করতে আসলে গিয়ে পিএইচডি স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলুন। তাদের এক্সপেরিয়েন্স জানতে চান। দেখুন, মানুষ কিভাবে কাজ করছে - কি নিয়ে কাজ করছে। মানুষের একটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে যা নিয়ে এক্সাইটেড, তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে সে খুশি হয়। এই হিউম্যান ন্যাচারকে বুঝে একে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলে অনেক কিছু শেখা সম্ভব।

ফিফথ, রাইটিং এর জন্য গ্র্যাজুয়েট কলেজ অনেক ওয়ার্কশপ করায়। আপনি বাংলা মিডিয়াম হলে বা জেনারেলি লেখা নিয়ে অস্বস্তি থাকলে, এইসব ওয়ার্কশপ অনেক সাহায্য করে। এগুলো ছাত্রদের জন্য ফ্রি থাকে। কলেজে অনেক সফটওয়্যার ওয়ার্কশপও থাকে - আপনি প্রোগ্রামিং বা কিছু শিখতে চাইলে, এসব কাজে লাগাতে পারেন। আপনার যদি টিচিং করতে হয়, ফান্ডিং এর জন্য - সেক্ষেত্রে টিচিং রিলেটেড ওয়ার্কশপগুলোও আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারে।

রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমার নিজের কিছু এক্সপেরিয়েন্স নিচে পয়েন্ট আকারে শেয়ার করলাম।

প্রথমত, রিসার্চ পেপার লেখার একটা ফরম্যাট থাকে। বিষয়ভেদে এটা আলাদা, কিন্তু মোটামুটি একটা ধাঁচ ফলো করা হয়। এই ফরম্যাটটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিখে নেওয়া উচিত। বড় জার্নালের কয়েকটা ভালো পেপার নিয়ে পড়ে ফরম্যাট বোঝাটা সবচেয়ে সহজতর উপায়। যেমন, ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ এর কয়েকটা পেপার নিয়ে বসলে অবশ্যই বেসিক আইডিয়া পাওয়ার কথা।

দ্বিতীয়ত, রেফারেন্স লিস্ট/ বিবলিওগ্রাফি কিভাবে তৈরি করে শিখে ফেলা। জার্নাল ফলো করে, গুগল স্কলার দেখে শেখা সম্ভব।

তৃতীয়ত, টেকনিক্যালি নিজেকে বিল্ড আপ করা। রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের সাথে পরিচিত হওয়াটা জরুরি। লেখার জন্য ওয়ার্ড এর পাশাপাশি ল্যাটেক্স শিখে ফেলা। ওভারলিফে ফ্রি একাউন্ট খুলেই ফরম্যাট ইউজ করা যায়। আপনি যে সফটওয়্যার ইউজ করেন, স্ট্যাটা - আর - ম্যাটল্যাব - তা থেকে কিভাবে টেবিল, গ্রাফ আপনার রাইটিং সফটওয়্যারে নেবেন, এটা শেখা।

এগুলো সহজ কাজ, কিন্তু আগে থেকে জানতাম না বলে, পিএইচডিতে ঢুকে সব একত্রে শেখা অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছিলো।

ফোর্থ, এবার আসা যাক, আসল রাইটিং এ। আমার ধারণা বাংলা মিডিয়ামে আমাদের যেভাবে ইংরেজি শেখানো হোতো, তার প্রথম কয়েকটা ঝামেলা হচ্ছে, ১) সেন্টেন্স যত কমপ্লিকেটেড, যত লম্বা, এবং/যদি/কিন্তু ভরা, তত ভালো, this is our perception। এটা ভুল। আমি আসলে লিখছি একটা অডিয়েন্সের জন্য যারা আমার মতই গবেষণা করে, তারা আমার একটা পেপারে হাজার ঘন্টা সময় দেবে না। লেখা ডাইরেক্ট হওয়া, সিম্পল হওয়া জরুরি। আমি আগে ছয়/সাত লাইন ধরে একটা বাক্য লিখতাম, নিজেই পড়ে পরে বুঝতে পারতাম না! আরেকটা ঝামেলা হোলো, প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা। লেখা যত পারা যায়, একটিভ ভয়েসে হওয়া উচিত। আমার রিসার্চ পেপারের প্রতিটা লাইনের দায় আমার, যদি প্যাসিভ ভয়েসে লিখি - অনেকটা মনে হয়, আর কেউ করে দিয়েছে, আমি ঠিক এইসব ভুল হলে দায়িত্ব নিচ্ছি না। এইদুটো জিনিস আমি এখন কেয়ারফুল থাকার চেষ্টা করি।

ফিফথ, আর্টিকেলের ব্যবহার। এটা আমি এখনো খুব কনফিউজ থাকি, কিন্তু খুব জরুরি একটা ব্যাপার। ইকনমিক্সে অন্তত লেখা প্রেজেন্ট টেন্সে রাখা প্রেফার করা হয়। প্রতিটা প্যারাগ্রাফের শেষের সাথে তার পরের প্যারাগ্রাফের শুরুটা যেন কানেক্টেড থাকে, খেয়াল রাখা। নাহলে মনে হবে জাম্পিং করে করে যাচ্ছে লেখা।

ষষ্ঠ, গ্রামার এর জন্য ভালো কিছু বই সংগ্রহে রাখা জরুরি। রাইটিং এর জন্য আলাদাভাবে The Craft of Research এবং Economical Writing পড়ানো হয় এইখানে গ্র্যাজুয়েট সকুলে। এই বইগুলো খুব ভালো।

সপ্তম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখা শুরু করা। নিজের ভেতরে ভয়ের জন্য দেখা যায় লেখা নিয়ে আমরা প্রোক্রাস্টিনেট করি। লেখাকে ভালো করার প্রথম উপায় হচ্ছে সময় দেওয়া। আমার নিজের লেখাই পড়লে বুঝি যেটা সময় দিয়ে লেখা সেটা অনেক বেশি পঠনযোগ্য। রেজাল্ট হাতে না থাকলে কেবল ডাটা সেকশন, কেবল ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু কিছু সেকশন লেখা শুরু করে দেওয়া। প্রয়োজনে অন্যদের সাথে গ্রুপ করে একত্রে লিখলে লেখার প্রতি দায়বদ্ধতা আসে।

অষ্টম, লেখা কিছুটা দাঁড় হওয়ার পর সাহায্য নেওয়া, অন্যদের ফিডব্যাক চাওয়া। লেখার মান নিয়ে লজ্জাবোধ থাকলে এই সাহায্য চাওয়া কঠিন। কিন্তু এটা খুব হেল্পফুল। আমার নিজের পিএইচডি প্রোগ্রামে রাইটিং ক্লাস ছিলো, তাতে অন্যদের ফিডব্যাক অনেক হেল্প করেছে।

নবম, আর কী - প্র্যাকটিস। যত বেশি ঘষামাজা করা যায়, ততই ভালো।

প্রথম পর্ব : সামাজিক বিজ্ঞান কি এবং কেন পড়বো?

বাংলাদেশে - এবং বাংলাদেশের মত অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রিতেই, পরিবার এবং বিদ্যালয় থেকে obsessed এর মত কিছু বিশেষ ক্যারিয়ার অপশনকে জন্মাবধি আওড়ানো হয়। obsess এর বাংলা যাই হোক, যে আচরণের কথা আমি বলছি, আমাদের পরিবারগুলোতে সবাই জানে তার সীমা কতটা পাগলামিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। বাচ্চাদের ধরে ধরে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি ডাক্তার হতে চাও নাকি ইঞ্জিনিয়ার?"। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার এর বাইরে বাংলাদেশি পরিবারগুলো গত দুই দশকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কল্যাণে আরও চিনেছে বিবিএ। এর বাইরে কোনও প্রফেশনাল চয়েসে আমাদের ছেলেমেয়েদের এক্সপোজারই তেমন হয় না। এবং, কেউ কেউ কিছুটা এর বাইরে বের হলে সেটাকে হাস্যকর/কৌতুক এর বিষয় বানিয়ে ফেলা হয়।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমার এই ব্লগ সিরিজের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের কিশোর-তরুণদের কাছে ক্যারিয়ার অলটারনেটিভ হিসেবে সোশ্যাল সায়েন্সের ভালোমন্দ দিকগুলো কিছুটা তুলে ধরা। আমার টার্গেটেড পাঠকগোষ্ঠী মূলত ক্লাস এইট থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। তবে, আশা করছি, এর কিছু অংশ অনার্স পড়ুয়া যে কোনও শিক্ষার্থীরও কাজে লাগবে।

"সামাজিক বিজ্ঞান" মূলত অনেকগুলো স্পেশালাইজেশনের একটি কালেকশন। বাইরের দেশে একে "কলেজ" এবং বাংলাদেশে "ফ্যাকাল্টি" বলা হয়। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যোশাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির মধ্যে আছে বর্তমানে ১৬ টি বিভাগ। অর্থনীতি, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভাগগুলো স্যোশাল সায়েন্সের মধ্যে পরে। কিন্তু, এটাও মনে রাখতে হবে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এই সাবজেক্টগুলো লিব্যারেল আর্টসের মধ্যে পরে। আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সটি যে কারণে "মাস্টার্স ইন স্যোশাল সায়েন্স", কিন্তু পরবর্তীতে আমার সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সটি "মাস্টার্স ইন আর্টস" এর সার্টিফিকেট দিয়েছে। এই তথ্যটা উল্লেখ করার কারণ, এই পার্থক্যগুলো এত পরিষ্কার না কিন্তু। এবং, তাতে কিছু যায়ও আসে না। যেমন, লিটারেচার মূলত সব জায়গাতেই আর্টস এর মধ্যে পরে (কলা বিভাগ), কিন্তু যখন সেই লিটারেচারের মধ্যেই কিভাবে সমাজকে, সমাজের বিবর্তনকে দেখা হবে - এই প্রশ্ন আসলে তাকে স্যোশাল সায়েন্স বলা যায়। আবার ইতিহাস বিভাগ হিসেবে কলাবিভাগের মধ্যে, কিন্তু অর্থনৈতিক ইতিহাস সাবজেক্টটি অর্থনীতির শাখা হিসেবেই অনেক জায়গায় পড়ানো হয়। আবার, অনেক জায়গায়, অর্থনীতি বিজনেস ফ্যাকাল্টিতেও পড়ানো হয়। যেমন বললাম, এই লাইনগুলো সাদাকালো হিসেবে আলাদা করা কঠিন। আমরা ক্যাটাগরিক্যালি স্যোশাল সায়েন্স রিলেটেড সবটা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবো।

একটা ওভারভিউ দিয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে, অর্থনীতি নিয়েই - যেহেতু আমার পড়াশোনা অর্থনীতিতে। টেক্সটবুক ডেফিনিশন হবে: অর্থশাস্ত্র দ্রব্য এবং সেবার ভোগ, উৎপাদন, এবং বন্টন নিয়ে কাজ করে। এই বাক্যের অর্থ বোঝা বেশ কঠিন, তাই ভাগ করা যাক। ভোগ - consumption - হচ্ছে প্রতিদিন আমরা যা যা ব্যবহার করি, কিছু না কিছু প্রয়োজনে। যেমন, আমি ভাত কিনে ভাত খাই - আমি ভাত consume করি বাজার থেকে মূল্য দিয়ে কিনে এনে। আবার, আমি স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করি। এখানে, আমি স্কুলে বেতন দিয়ে এডুকেশন consume করি। অন্যদিকে, production হচ্ছে আমি বাজার থেকে জিনিস কিনতে টাকা পাওয়ার জন্য যা যা করি। এটা হতে পারে, আমি শিক্ষকতা করি - তাহলে আমি এডুকেশন প্রোডিউস করি। আবার, আমি ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংকের সেবা (সার্ভিস) নেই। এই সম্পূর্ণ সার্কেল - আমি কি ভোগ করি, কি উৎপাদন করি, কি সেবা নেই - এই নিয়েই অর্থনীতির আলোচনা। আবার, এখানে আমার বদলে যদি একটি দেশ হয় - দেশ তার সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে যা উৎপাদন, ভোগ এবং বন্টন করে। একা আমি বা পুরো দেশের বাইরে, চিন্তা করা যেতে পারে, একটি গ্রাম বা একটি জেলা, কিংবা পুরো সাউথ এশিয়া নিয়ে। এক কথায় এখন - সীমিত সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন/ভোগ করা যায়, তাই নিয়েই অর্থনীতির আলোচনা। উদাহরণ দিচ্ছি আমার নিজের গবেষণা থেকে। আমার স্পেশালাইজেশন "এনভায়রনমেন্টাল ইকনমিক্স"। আমার পিএইচডি থিসিসে আমি কিভাবে সরকারি পলিসির কারণে মানুষ পরিবেশের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ বা লাভবান হয়, তা নিয়ে আলোচনা করা। আমি ডাটা থেকে বের করার চেষ্টা করি যে কোনও একটি পরিবেশজনিত পলিসি দ্বারা মানুষের ভালোমন্দ কিছু এফেক্ট হয় কিনা। আমার কাজ পুরোই তথ্যভিত্তিক - এপ্লাইড ইকনমিক্স যেটাকে বলে।

অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে মানুষ এবং সমাজের উন্নয়ন, গঠন এবং কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা। বোঝার চেষ্টা করা মানুষ কেন ইন্টারেক্ট করে, কিভাবে করে, বৈষম্য কিভাবে কাজ করে সমাজে, বিভিন্ন উন্নয়নের ফলে সমাজে কি পরিবর্তন হয় ইত্যাদি। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা যেমন অপরাধ বেড়ে যাওয়া, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়ে যাওয়া, নারী-পুরুষের বৈষম্যের কারণে কি কি সমস্যা তৈরি হয় - এই নিয়েও সমাজবিজ্ঞান কাজ করে। এরপরে, পলিটিক্যাল সায়েন্সের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্র, স্টেট, লোকাল ইত্যাদি সব লেভেলের রাজনৈতিক ইন্টারেকশন নিয়ে কাজ করা। একটা বিশাল অংশ মূলত পার্টিশান ইনভলভমেন্ট নিয়ে কাজ করে। আবার, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন মূলত রাষ্ট্রে বিভিন্ন এফেয়ার কিভাবে ব্যবস্থা করা হবে, পাবলিক পলিসি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এই নিয়ে আলোচনা করে। অন্যান্য স্যোশাল সায়েন্সের বিশাল অংশ মূলত সমাজবিজ্ঞান এর থেকে বের হয়ে তৈরি হওয়া স্পেশালাইজেশন।

অনেকক্ষেত্রেই মনে হতে পারে, ইকনমিক্স, স্যোশিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স এর অনেক গবেষণাক্ষেত্রই একে অপরের সাথে জড়িত। এর কারণটা সোজা, সমাজ অবিচ্ছিন্ন একটা কাঠামো - স্যোশাল সায়েন্স এর বিভিন্ন

অংশকেই বোঝার চেষ্টা করে। তাই, আমার কারেন্ট ইকনমিক্সে প্রজেক্টে যখন আমি ভোটিং বিহেভিয়ার বোঝার চেষ্টা করছি, তখন একে ইকনমিক্স বা পলিটীক্যাল সায়েন্স দুইদিকেই প্লেস করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, এই প্রতিটি সাবজেক্টের আলাদা আলাদা Toolbox আছে। আমি যখন মূলত ইকনমিক্সের Toolbox ব্যবহার করবো, তখন একে মূলত ইকনমিক্স বলা হবে। আর এই Toolbox এ কি কি আছে, সেটাই শেখানো হয় এই সাবজেক্টগুলোতে। যেমন, ইকনমিক্স অন্যান্য স্যোশাল সায়েন্সের থেকে অনেক বেশি কোয়ান্টিটেটিভ। ম্যাথ এবং পরিসংখ্যানের বিশাল ব্যবহার ইকনমিক্সে করা হয়, যেটা অন্যান্য স্যোশাল সায়েন্সে কম। ক্যারিয়ারক্ষেত্রেও এই সাবজেক্টগুলোর অনেক ওভারল্যাপ আছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগগুলোর শর্ট ইন্ট্রোডাকশনের পর স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের প্রশ্ন আসবে - এইসব বিষয়ে পড়ে কি কি ক্যারিয়ার চয়েস সামনে খোলা থাকবে? জীবনের একটা বিশাল অংশ জুড়েই থাকবে "কাজ", সেই কাজের আনন্দের জন্য একটা যুতসই ক্যারিয়ার খুব জরুরি। ক্যারিয়ার হওয়া উচিত এমন একটা কাজ যা প্রতিদিন নতুন কিছু শেখাবে, যা করতে ভালো লাগবে। দেখা যাক, স্যোশাল সায়েন্স আমাদের কি কি ক্যারিয়ারের দিকে নিয়ে যায়। বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে স্যোশাল সায়েন্সে কাজের ক্ষেত্রগুলো নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, একাডেমিকঃ বিশ্ববিদ্যালয়-লেভেলে শিক্ষকতা করা যায়। এর জন্য দেশে কেবল অনার্স বা মাস্টার্স লাগে। কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে পিএইচডি এবং আরও বেশি (পোস্টডক) থাকা লাগে। পাবলিকেশনের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত, ডেভেলপমেন্ট সেক্টরঃ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউএনডিপি ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্যোশাল সায়েন্সের বিভিন্ন সেক্টরের মানুষের ডিমান্ড অনেক বেশি। এইসব চাকরির ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ সময়েই পিএইচডি প্রয়োজন হবে। কিছু জুনিয়র লেভেলে শুধু মাস্টার্স যথেষ্ট।

তৃতীয়ত, এনজিও সেক্টরঃ দেশে এবং বাইরে এনজিও সেক্টরে কনসালটেন্সি করা অনেকেরই প্রথম পছন্দ থাকে। প্ল্যানিং বিষয়ক অন্যান্য চাকরিতেও স্যোশাল সায়েন্সের অনেক ডিমান্ড।

চতুর্থত, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিঃ ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট ধরণের অনেক জবে ইকনমিস্টদের ডিমান্ড থাকে।

পঞ্চম, ব্যাংকিংঃ সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকিং সেক্টরে ইকনমিক্সের ছাত্রদের ডিমান্ড অনেক বেশি।

ষষ্ঠঃ সরকারি চাকরি: সরকারি চাকরি এবং আধা-সরকারি চাকরিতে স্যোশাল সায়েন্সের অনেক ছাত্রই যায়। বাংলাদেশের অনেক নামকরা স্যোশাল সায়েন্টিস্টই সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, এবং পাবলিক পলিসিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

সপ্তম, ইন্ডাস্ট্রি জবঃ ইন্ডাস্ট্রিতে জব করা অনেকেরই প্রধান লক্ষ্য থাকে। ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসেবেও অনেকে কাজ করতে পছন্দ করেন।

দ্বিতীয় পর্বঃ স্যোশাল সায়েন্সে সাবজেক্ট চয়েস

স্যোশাল সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো এবং তাদের জব প্রসপেক্ট বোঝার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোলো আন্ডারগ্র্যাডে এডমিশন টেস্টের পর কিভাবে সাবজেক্ট নির্বাচন করা যায়। বাংলাদেশে বিদঘুটে এডমিশন টেস্টের কারণে এই বিশাল সিদ্ধান্তটি আমাদের এডমিশন টেস্টের পরপর নিতে হয়, এবং প্রায় কোনও ধারণা ছাড়াই শুধুমাত্র র‍্যাংকিং এর উপর নির্ভর করে।

আপাতত, সিদ্ধান্তগুলো ছেলেমেয়েরা সাধারণত গড়পড়তা হিসেবে নিয়ে থাকে। অর্থাৎ, যদি আমার এডমিশন টেস্টের রোল হয় ৫০ এবং আমার আশেপাশে সবাই অর্থনীতি নেয়, তাহলে আমিও অর্থনীতি নেবো। এই সিদ্ধান্তের ধরণটির মধ্যে আমরা আমাদের ইন্টারেস্ট, জব টার্গেট, পারসোনালিটি এইসব নিয়ে বিচার করি না।

এই পোস্টে আমি এইকয়টি বিষয় নিয়ে আমার অভিজ্ঞতায় কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমত, কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে স্যোশাল সায়েন্সে সাবজেক্ট চয়েসের সময়?

১) ইন্টারেস্টঃ অবশ্যই আমি কি পড়তে চাই, কি বিষয়ে আগ্রহী - এটা বুঝতে পারা জরুরি। সিলেবাস জোগাড় করে ঘেঁটে দেখা যেতে পারে আরও ভালো করে পার্থক্য বোঝার জন্য।

২) জব টার্গেটঃ কি কি ধরণের জব করতে আমি বেশি আগ্রহী। আমি কি রিসার্চ লাইনে যেতে আগ্রহী। এই প্রশ্নগুলো নিজেকে করা জরুরি।

৩) স্কিলসেটঃ স্যোশাল সায়েন্সের মধ্যে ইকনমিক্স প্রচণ্ডভাবে ম্যাথ নির্ভর। ভালো বা মন্দ যাই হোক, ম্যাথে ইন্টারেস্ট না থাকলে ইকনমিক্সে ভালো রেজাল্ট করা বেশ কঠিন। এই বিষয়গুলো নিয়েও ভাবতে হবে - আমি অনেক পরিশ্রমী ছাত্রকে দেখেছি ইকনমিকস নিয়ে হতাশ হয়ে যেতে কারণ আগে ম্যাথ করা ছিলো না।

৪) ফ্যাকাল্টি রিসোর্সঃ কিছু বিভাগে ভালো শিক্ষকের সংখ্যা অন্য বিভাগের চেয়ে বেশী থাকতে পারে। শিক্ষকের মান, তাদের মানসিকতা একটা ছাত্রের জীবন বদলে দেয়। শিক্ষক নিয়ে কিছু জানাশোনা রাখা ভালো এই সিদ্ধান্তের জন্য।

৫) ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিসোর্সঃ অন্য কি কি সুবিধা দিতে পারে বিভাগ থেকে? কম্পিউটার ল্যাব? আলাদা লাইব্রেরি? জার্নাল এক্সেস? এইসব নিয়ে কিছু খবর নেওয়া ভালো।

দ্বিতীয়ত, ধরা যাক, এইসব বিচারবিবেচনা করেই আমি যে সাবজেক্টে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম সেটাতে পেলাম না। এবং, তার পরের কোনও একটায় পেলাম। মনে রাখা জরুরি, স্যোশাল সায়েন্স খুব ইন্টার-রিলেটেড একটা ধারণা। এখানে এক বিষয়ে আন্ডারগ্র্যাড করে আরেক বিষয়ে মাস্টার্স করে আরেক বিষয়ে পিএইচডি এর চান্স বেশিরভাগ সময়েই খোলা। হতাশ হয়ে যাওয়ার কিছু নেই। যেটাতে চান্স পেয়েছি, সেটাতেই পড়ে - যেটাতে পড়ার লক্ষ্য ছিলো, তার দিকে নিজের প্রোফাইল সাজিয়ে পরে হায়ার স্টাডিজের এপ্লাই করাই যাবে। অর্থনীতির অনেক ছাত্র যেমন পরে হেলথ/পাবলিক পলিসিতে চলে যায়, আবার স্যোশিওলজির ছাত্ররা পড়তে পারে জেন্ডার

স্টাডিজ নিয়ে। এইসব বাঁক পেরোনোর ব্যাপারে স্যোশাল সায়েন্স অন্য অনেক ফ্যাকাল্টির চেয়ে বেশী সুবিধাজনক।

যেমন, আমার বর্তমান রিসার্চের একটা বিশাল অংশ আসলে পলিটিক্যাল ইকনমির কাজ, যেটা অনেকসময়েই ওভারল্যাপ করা পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাথে। তার মানে, এই ধরণের রিসার্চ আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হলেও করতে পারতাম।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো র‍্যাংকিং নেই। তাই আমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বেস্ট স্যোশাল সায়েন্সের জন্য, এই নিয়ে কিছু বলতে আগ্রহী না। লোকেশন, টিউশন ফি, থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্যোশাল সায়েন্সের মধ্যে মূলত ইকনমিকসই পড়ানো হয়। সেটা মাথায় রাখতে হবে।

তৃতীয় পর্বঃ আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্র হিসেবে করণীয় কি কি

আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্র হিসেবে করণীয় কি কি, এটা লিস্ট ধরে বলা কঠিন। কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী নতুন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঢুকে মানিয়ে নিতে পারে না, এবং পরে এই ঘোলাটে জায়গা থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে যায়। জীবনে সমস্যা আসবেই, কিন্তু সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে। এই পোস্টের উদ্দেশ্য আমার নিজের জীবনের এবং আশেপাশের দেখা বন্ধুদের সমস্যা নিয়ে কথা খোলামেলা কথা বলা।

যে সমস্যাগুলো মূলত হতে পারে -

১) জীবনে প্রথম স্বাধীনতাঃ আমাদের অনেকের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাটাই হোলো জীবনে প্রথম কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়া। অনেকেই বাবামা এর বাসা থেকে হলে ওঠে এই প্রথমবার, সেটাও মানসিক চাপের কারণ হয়। হলের পরিবেশ বাংলাদেশে খুব নোংরা এবং ছাত্র-অবান্ধব, হলে থেকে ছাত্রজীবনকে সিস্টেমে রাখা কঠিন।

২) নতুন পরিবেশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ হাইস্কুল থেকে অনেক ভিন্ন। সারাদিন ক্লাস কোচিং এর চাপ থেকে বাইরে আসা হয়। বাংলাদেশে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটেন্ডেন্স নেওয়া হয় না। হলেও খুব কম পার্সেন্টেজে কাটিয়ে দেওয়া যায়। এই চাপ না থাকা অনেককেই ঘাবড়ে দেয়।

৩) নতুন স্ট্রাগলঃ অনেকেই এমন সাবজেক্টে ভর্তি হয় যার আগে থেকে কোনো ধারণা থাকে না। এবং, ইন্টারেস্ট তৈরি করার মত কোনো ক্লাস বা প্রেরণা থাকে না বা খুঁজে নেওয়ার ইচ্ছা থাকে না। অনেক জায়গায় পরিবেশ (সতীর্থ/ শিক্ষক) এত বেশী টক্সিক থাকে যে মানিয়ে নেওয়ার চেয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া সহজ হয়ে যায়।

৪) সাপোর্ট সিস্টেম না থাকাঃ অনেক ছাত্র নতুন পরিবেশে এসে মানিয়ে নিতে পারে না সাপোর্ট সিস্টেমের অভাবের কারণে। বলাই বাহুল্য, নতুন ছাত্রদের মোটিভেট করার জন্য আমাদের ইনক্লুসিভ কোনও ব্যবস্থা নেই।

৫) স্ট্রাকচার না থাকাঃ বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্তত আমার সময়ে স্ট্রাকচারের বিশাল অভাব ছিলো। একই ক্লাস তিন/চারবার শিক্ষক বদল করা হয়েছে, ক্লাসে মিডটার্ম নেওয়া কখনো হলেও খাতা কোনোদিন ফেরত দেওয়া হয় নাই। যেরকম সিস্টেমের ভেতর থেকে স্কুলকলেজে ছিলাম, তার থেকে পুরোই উলটো ছিলো।

৬) শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কঃ স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকদের সাথে পারসোনাল সম্পর্ক থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্পর্ক খুব কম জায়গাতেই আছে। শিক্ষকদের ইনসেন্টিভ নেই, এত বড় ক্লাস সামলানোই কঠিন। শিক্ষকদের টিচিং এসিস্টেন্ট থাকে না, সুতরাং তাদের জন্যও কাজটা সহজ না। টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা না থাকার কারণে কোনও সমস্যা হলেও তা সমাধানের উপায় পাওয়া যায় না।

৭) রাজনীতি এবং অন্যান্য হাতছানিঃ এর পর বলাই বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেক এডমিনিস্ট্রেটিভ ফাঁকফোকর এর কারণে রাজনৈতিক দলের টানাটানি থাকে। টানাটানি না থাকলেও অনেকে দেশ বদলানোর সহজ উপায় হিসেবে রাজনীতিতে জড়িত হয়। এমন অনেক হাতছানির কারণে ছেলেমেয়েরা প্ল্যান করে আগাতে পারে না। প্ল্যানিং এ সাহায্য করার জন্য এডভাইজারও থাকে না কেউ।

8) একবার পিছিয়ে পড়লে মোমেন্টাম হারিয়ে ফেলাঃ এবং, সবচেয়ে বড় সমস্যা হোলো একবার পিছিয়ে পড়লে "আমাকে দিয়ে হবে না" এটা ধরে নিয়ে আমরা অনেকেই হাল ছেড়ে দেই। পড়াশোনার আগ্রহ চলে যায়, একটা কিছু দেখা যাবে এমন সাইকোলজিতে মানুষ চলে যায়।

৯) টাকা রোজগারের হাতছানিঃ অনেক শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টার, টিউশনি ইত্যাদি চক্রে পড়ে এত বেশী সময় নষ্ট করে যেটা তার ক্যারিয়ারে বেশী একটা সাহায্য করে না।

সমাধানের কিছু পথঃ

১) এক্সপ্লোরঃ আন্ডারগ্র্যাডের সময়টা এক্সপ্লোর করতেই হবে, এক্সপ্লোর মানে বিভিন্ন পথে ইন্টারেস্ট আছে কিনা খুঁজে দেখা। এর জন্য ডিপার্টমেন্টে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্লাব, পত্রিকা ইত্যাদিতে সময় দেওয়া যায়। বিভিন্ন ক্লাস এটেন্ড করে কি ভালো লাগে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য বিভাগে ক্লাস করার দরজা বেশিরভাগ সময়েই খোলা থাকে, তাও করা যায় যদি ইন্টারেস্ট থাকে।

২) এক্সপ্লোরেশনের ম্যাপিং: কিন্তু, এই এক্সপ্লোরেশন ম্যাপিং থাকতে হবে। আমি এক্সপ্লোর করতে গিয়ে যদি ক্লাবের পেছনে ১০০ ভাগ সময় দিয়ে দেই, তার কোনও অর্থ হয় না। এক্সপ্লোর করে কি শিখছি, সেটাই বড় কথা।

৩) বুলিয়িং ভয় না পাওয়াঃ নতুন হলের পরিবেশ বা ডিপার্টমেন্টের পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারলে দোষের কিছু নেই। আমি পারসোনালি নিজেও অনার্সের আগে এত টক্সিক পরিবেশ দেখি নাই আশেপাশে। কিন্তু এর সাথেই টিকে থাকতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যেন সস্তা প্রলোভনে আমরা নিজেরাও টক্সিক হয়ে না উঠি। এর বিপরীতে প্রধান যে কাজটা করা যায়, তা হোলো সমমনা বন্ধু খুঁজে বের করা।

৪) হল পরিবেশ নিয়ে সতর্ক থাকাঃ বাংলাদেশে হলের অবস্থা অনেক খারাপ। প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যেন একটা পড়াশোনার জায়গা থাকে। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার।

৫) স্টাডি পার্টনার বের করাঃ পড়াশোনায় ভালো করার এই পর্যায় থেকে সবচেয়ে উপাকারি উপায় হচ্ছে সমমনা একটিভ সহপাঠী খুঁজে বের করা। যেহেতু আমাদের টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা নেই, সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করেই সমস্যাগুলো বুঝতে হবে। সিনিয়র যারা ভালো করছে, তাদের থেকে সাহায্য নেওয়া যায়। নেটওয়ার্কিং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সময় থেকে।

৬) বিভিন্ন লেখালেখিতে যুক্ত থাকা, এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিঃ আমি পারসোনালি মনে করি, এই বয়সের সবার কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখির সাথে জড়িত থাকার অভ্যাস করা উচিত। আমি বিভিন্ন ছোটোখাটো পত্রিকায় ওইসময় লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, যেটা আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিলো আমি গবেষণা পছন্দ করি কিনা। আবার লেখালেখির মাধ্যমে পড়াশোনা পছন্দ করে এমন আরও মানুষের সাথে পরিচয় হয়। টেক্সটবুকের বাইরে পড়াশোনার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

৭) রাজনীতিঃ রাজনীতি সচেতন হতেই হবে সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের। কিন্তু ছাত্ররাজনীতিতে একটিভ হওয়া বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুফল নাও বয়ে আনতে পারে। খোঁজখবর রাখা, অবজার্ভ করাটা যদিও জরুরি।

৪) শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কঃ যেসব শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্য করতে চান তাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া এবং একটিভলি তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং করা। ভালো শিক্ষকেরা ভালো গাইডেন্স দিতে পারবেন, অনেক পথ খুলে যেতে পারে এই সম্পর্কগুলোর মাধ্যমে।

৯) ক্যারিয়ার অপশন এক্সপ্লোরঃ আমাদের ছেলেমেয়েদের একটা প্রথম বড় সমস্যাই হচ্ছে আমরা প্রথম থেকে ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করি না। আমার ক্যারিয়ার অপশন কি কি - আমি কিভাবে নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত করতে পারবো, এই চিন্তা প্রথম থেকেই থাকা উচিত।

১০) স্কিল ডেভেলপমেন্টঃ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্তত সামাজিক বিজ্ঞানে স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে বিশ্বমান থেকে অনেক পেছনে। আমি বাইরে আসার পর অনেক হোঁচট খেয়েছি কোনও প্রোগ্রামিং না জানার কারণে। ডাটা সফটওয়্যারগুলো চেনা, প্রোগ্রামিং শেখা, ইংরেজি স্পিকিং এবং রাইটিং এ সময় দেওয়া - এগুলো লং-টার্মে অনেক সাহায্য করবে।

১১) ইন্টার্নশিপঃ সেকেন্ড ইয়ার থেকেই ইন্টার্নশিপ বা রিসার্চ এসিস্টেন্টশিপ খুঁজে দেখা উচিত। এই এক্সপেরিয়েন্স সিভিকে অনেক সাহায্য করবে।

১২) ভলান্টিয়ারিং লিডারশীপ স্কিলঃ আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে লিডারশীপ স্কিল। সব বিভাগেই কিছু কাজ থাকে যাতে ছাত্রদের সাহায্য লাগে। কনফারেন্স অর্গানাইজ করা, সেমিনার দেখা, প্ল্যানিং করা - এইসব দক্ষতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

১৩) কমিউনিটি মেম্বার হওয়াঃ উপরের সব পয়েন্ট যে কোনও সময় শেখা সম্ভব - যে একটি ব্যাপার একবার করে ফেললে আর বদলানো যায় না তা হোলো মানুষের সাথে ব্যবহার। যেমন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি কিভাবে ঢাকার ছেলেমেয়েরা মফস্বলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসাহাসি করে সময় কাটায়। শর্ট টার্মে এতে অনেকসময় পপুলারিটি পাওয়া যেতেও পারে, কিন্তু অন্যকে ডিমোটিভেট করে আনন্দ পাওয়ার মত নোংরামি বন্ধ হওয়া উচিত।

এই তিনটি পর্ব মোটামুটি সব ছাত্রের জন্যই লেখা। এর পরের কয়েকটা পর্ব শুধু অর্থনীতির ছাত্রদের জন্য থাকবে।

চতুর্থ পর্বঃ ক্যারিয়ার হিসেবে রিসার্চ

এখন থেকে পর্বগুলো মূলত অর্থনীতির ছাত্রদের গবেষণাভিত্তিক ক্যারিয়ারের প্রেক্ষিতে লিখবো। কারণ এই ক্যারিয়ারটি নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি। অন্যান্য ডিটেইলসে যাওয়ার আগে প্রথমে আলোচনা করা যাক কি কি ধরণের ক্যারিয়ার নিয়ে আমরা কথা বলছি।

অর্থনীতি বিভাগে ক্যারিয়ার হিসেবে যে দুইটি প্রধান হয়েছিলো সবসময়েই তা হোলো ঃ বিসিএস ক্যাডার এবং গবেষণাধর্মী কোনও কাজ। বিসিএস ক্যাডার হওয়ার জন্য প্রায় সেকেন্ড বা থার্ড ইয়ার থেকেই ছেলেমেয়েরা বিসিএস এর প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে। আমাদের ব্যাচ থেকে প্রায় ৩০ এর উপর ছাত্রছাত্রী বিসিএস ক্যাডার হয়েছিলো। এছাড়া অন্যান্য ক্যারিয়ারের মধ্যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এবং ব্যাংকেও অনেকে গিয়েছিলো।

বাকি একটা বিশাল অংশ বিভিন্ন ধরণের গবেষণাকাজে জড়িত আছে। অর্থনীতি থেকে পড়াশোনা করে যে ধরণের গবেষণাকাজ পাওয়া সম্ভব, তার তালিকাটা এমন হবেঃ

১) রেজাল্ট খুব ভালো হলে পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিজের ডিপার্টমেন্ট কিংবা অন্য কোথাও) লেকচারার হিসেবে জয়েন করা। লেকচারার অস্থায়ী চাকরি, কয়েক বছর পর সহকারী অধ্যাপক হওয়ার জন্য এপ্লাই করা যায়।

২) বিআইডিএস বা অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা।

৩) ব্র্যাক, সিপিডি, সানেম ইত্যাদি প্রাইভেট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করা।

৪) এছাড়া দেশে আরও অনেক এনজিও এবং ছোটোখাটো গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে যাতে কাজ করা যায়।

গবেষণাতেই নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করতে চাইলে এর যে ধাপেই শুরু করা হোক না কেন, পিএইচডি আসলে মোটামুটি লাগবেই। আমি পারসোনালি মনে করি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য যত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা যায়, ততই ভালো। মাস্টার্স, পিএইচডি মিলিয়ে অনেক স্টেপ যেতে হয়; আসার প্রিপারেশনও অনেক কঠিন। এর ধাপগুলো অনার্স চলাকালীন শুরু করলে সময় বাঁচে। যদি অনার্স চলাকালীন হায়ার স্টাডিজের জন্য এপ্লাই করতে হয় তবে ফোর্থ ইয়ারে থাকতে বা অনার্স পরীক্ষার পরপরই জিআরই, টোফেল দিয়ে এপ্লাই করতে হবে।

এই সিদ্ধান্তটা অনার্সের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই তাই নিতে হবে। অনার্স শেষেই কি বাইরে এপ্লাই করবেন হায়ার স্টাডিজের জন্য নাকি আগে দেশে কিছুদিন চাকরি করে তারপর করবেন? সিদ্ধান্তটা থার্ড ইয়ারের মধ্যে নিয়ে নিলে প্রিপারেশন নিতে সুবিধা হবে।

আমি পারসোনালি মনে করি অনার্সের পরপর সময়টা এপ্লাই এর জন্য সবচেয়ে ভালো। একবার জবে ঢুকে গেলে জিআরই এর মত কঠিন পরীক্ষার পড়াশোনার সময় বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর হায়ার স্টাডিজ যদি করতেই হয়, তবে আগে থেকেই নয় কেন? স্টাডি গ্যাপ দেওয়ার ফলে বেনেফিট তো তেমন নেই। কিন্তু, পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভেদে এই সিদ্ধান্ত ডিপেন্ড করবে। দেশে যদি কিছুদিন চাকরি করতেই হয়, তবে উপরে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলো নামকরা।

সুতরাং, আমার হিসেবে টাইমলাইনটি এমন হতে পারেঃ থার্ড ইয়ার থেকে হায়ার স্টাডিজ এর খোঁজ খবর নেওয়া, শিক্ষকদের সাথে কথা বলা, স্কুল দেখা, বাইরে কোনও দেশে প্রেফারেন্স থাকলে তা ঠিক করা, জিআরই এবং টোফেলের জন্য বইপত্র জোগাড় করা এবং প্রিপারেশন নেওয়া কিছুটা করে, রিসার্চ এসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করে এক্সপেরিয়েন্স জোগাড় করা। এরপর, ফোর্থ ইয়ারে পরীক্ষা শেষ করে জিআরই দিয়ে দেওয়া। পরের বছর ফল সেমিস্টারে এপ্লাই করার জন্য কাগজপত্র ঠিক করা এবং এপ্লাই করা।

এরপরে এপ্লাই করতে চাইলেও টাইমলাইন প্রায় একই থাকবে। ইকনমিক্স এর ফান্ডিং মূলত ফল সেমিস্টারেই দেওয়া হয়।

তাহলে এখন প্রশ্ন আসে, এই সিদ্ধান্ত থার্ড ইয়ারের মধ্যে কিভাবে নেওয়া যায়? কিভাবে বুঝতে পারবো আমি গবেষণা করতে আগ্রহী কিনা। আমাদের যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্র্যাড গবেষণার রাস্তা প্রায় একটা নেই, তাই এর বেশিটাই নিজেকে বুঝে নিতে হবে। আমার মতে, কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিতঃ

রিসার্চের কাজের সাথে যতটা সম্ভব পরিচিত হওয়া। তারচেয়েও বড় কথা বোঝার চেষ্টা করা রিসার্চ আমার ভালো লাগছে কীনা। রিসার্চকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে হলে প্রচণ্ড প্যাশেন্ট মানুষ হতে হয়। পাঁচ/দশ বছর

লাগিয়ে কিছু করার ধৈর্য সবার থাকে না, থাকতে হবে এমন কথাও নেই। কিন্তু যদি না থাকে, তাহলে এই লাইনে কাজ শুরু করলে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে পড়তে হতে পারে।

কিভাবে বুঝবেন ভালো লাগে কীনা? একটা বড় জিনিস হচ্ছে, "জানতে" ভালো লাগে কীনা। ধরুন, আমরা যেহেতু স্যোশাল সায়েন্সের কথা বলছি - দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে, বিভিন্ন মত - থিওরি জানতে কি আগ্রহ বোধ করছেন। তর্ক করতে এইসব বিষয়ে আগ্রহ বোধ করছেন? নীলক্ষেতে হাঁটার পথে হঠাত ইতিহাসের একটা বই দেখে কি আটকে যাচ্ছেন? বের করুন আপনার ক্যাম্পাসে অন্য কারা প্রবন্ধ/সাহিত্য চর্চা করে, এদের অনেকেই পত্রিকা, লিটল ম্যাগ বের করে। এইসব পত্রিকার সাথে কাজ করলে গবেষণার প্রতি আগ্রহ আসলেই পাচ্ছেন কীনা বুঝতে সাহায্য করতে পারে। ঢাকায় "হালখাতা" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক আমাকে প্রতি তিন মাসে একটা এমন লিখতে দিতেন। আমি ঐ পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যায় সবচেয়ে জুনিয়র লেখক ছিলাম অনার্স পড়াকালীন সময়ে। লেখার বিষয়গুলো সব সামাজিক-রাজনৈতিক ছিলো। এই কাজগুলোর মাধ্যমে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ তৈরি করে নিলে লং-টার্মে অনেক কাজে লাগতে পারে।

আপনার ফিল্ডে বড় কাজ কারা করছেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চার কারা? তাদের কাজ, পেপার-বই এসব যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করুন। আপনার ফিল্ডের বাইরে যারা একই বিষয়ে কাজ করেন, তাদেরটাও জানার চেষ্টা করুন। যেমন, আপনি অর্থনীতিতে পড়লে স্যোশিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স এগুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করুন। ইতিহাস বলতে কিছু আমাদের অর্থনীতি বিভাগে শেখানো হয় না, অথচ ইতিহাসকে বাদ দিলে অর্থনীতি চর্চাই করা সম্ভব না (well, I work on economic history, might be biased!)। আপনার ফিল্ডের লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করুন, সেমিনার - ওয়ার্কশপ আশেপাশে কিছু হলে এটেন্ড করুন। কারো কাজ ভালো লাগলে বোঝার চেষ্টা করুন, কেন ভালো লাগছে। এই কাজের এক্সটেনশন কি হতে পারে?

আপনি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে কাজ শুরু করলে প্রথম এক বছর শুধু সিলেবাস থাকবে। তার পর জ্ঞানের মহাসমুদ্রে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বলা হবে, নিজের রিসার্চ প্রশ্ন খুঁজে বের করে আনতে। আপনি আজকে যত বেশি পড়বেন, জানবেন, ওপেন চিন্তা করতে - নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে তৈরি থাকবেন, ততই ভালো রিসার্চের বিষয় খুঁজে বের করতে পারবেন। এটা একটা প্র্যাকটিস, নিজেকে সিস্টেমে রেখে চিন্তা করতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানে কাজ করার সুবিধা হোলো, অনেক প্রশ্ন আমাদের আশেপাশেই পড়ে আছে - শুধু দৃষ্টিশক্তি তৈরি হলেই দেখা সম্ভব। আর এইজন্য প্রয়োজন প্রতিনিয়ত নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়া। আপনি যখন একটা থিওরি পড়ছেন, ভাবার চেষ্টা করুন

আশেপাশের কোন এক্সামপলগুলো দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন ধরুন, আপনি থিওরি পড়লেন মার্কেট রিলেটেড - যা পড়ছেন, তা দিয়ে বাংলাদেশের কাঁচাবাজারকে কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন? এটাই চ্যালেঞ্জ। চোখকান খোলা রাখুন, এলার্ট থাকুন। একটা নোটবুক রাখুন প্রথম থেকেই যেখানে আইডিয়া লিখে রাখা যাবে।

কেবল রিসার্চ ভালো লাগলেই কিন্তু হবে না, নিজের ক্লাস - কোর্স এর মধ্যে ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন কিনা এটাও বড় ব্যাপার। আন্ডারগ্র্যাডে রেজাল্ট ফার্স্ট বা ফিফথ বা টেনথ এর মধ্যে পরবর্তী জীবনে বেশি একটা পার্থক্য নেই, কিন্তু আপনি যদি একেবারেই আগ্রহ না পান কোনও ক্লাসে, সেটা হয়তো ইন্ডিকেট করবে এই বিষয়ে হায়ার স্টাডিজে আপনি আগ্রহী না। সেক্ষেত্রে, অন্য কোন বিষয়ে আপনি আগ্রহী, তা খুঁজে দেখা যেতে পারে।

পঞ্চম পর্বঃ প্রস্তুতিপর্ব

এই পর্বে ধরে নিচ্ছি আপনি জানেন যে দেশে অর্থনীতিতে আন্ডারগ্র্যাডের পর আপনি বাইরে আসতে চান পড়াশোনার জন্য। অনেক সময় ছাত্ররা নিজেরাই জেনে ভর্তি হয়, আবার অনেক সময় কোনও শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত হয়। আমি মোটামুটিভাবে একটা প্ল্যানিং ম্যাপ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

বাইরে পড়াশোনার জন্য আসতে আন্ডারগ্র্যাডে থাকতে আপনি কি কি করতে পারেন নিজেকে প্রস্তুত করতে-

১) রেজাল্টঃ রেজাল্টের মূল্য আসলে সবজায়গাতেই আছে। সিজিপিএ যেন বেশ ভালো থাকে, এই ব্যাপারে নজর রাখা জরুরি। ফার্স্ট ই হতে হবে, না হলে জীবন শেষ - এমন কিছু না, কেবল ঠিকঠাক বোঝানো যে আপনি ক্লাসে টপ কয়েকজনের একজন ছিলেন।

২) ম্যাথ রিলেটেড সাবজেক্ট গুলো নেওয়াঃ বাইরের দেশে যারা পিএইচডি করে ইকনমিক্সে, তারা ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ম্যাথ কোর্স নেয় - রিয়েল এনালাইসিস, ক্যালকুলাস, লিনিয়ার এলজেব্রা। আমাদের সে সুযোগ নেই, কিন্তু যতটা সুযোগ আছে, তার সম্পূর্ণ সৎব্যবহার করা জরুরি।

৩) স্ট্যাটিস্টিকস এবং ইকোনমেট্রিক্সঃ এর পরের টেকনিক্যাল জায়গাটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি এবং ইকনমেট্রিক্স। এই দুই ক্ষেত্রেও স্কিল তৈরি করা জরুরি।

৪) সফটওয়্যার স্কিলঃ হাতে ধরে কেউ সফটওয়্যারের কাজ শিখিয়ে দেবে না। সুতরাং প্রথম থেকে নিজে উদ্যোগ নিয়ে শেখাটা জরুরি - স্ট্যাটা, আর, আর্কজিআইএস (ম্যাপের জন্য) - এই তিনটাই বেশী জরুরি। পাইথন অনেক সময় সাহায্য করে।

৫) ইংরেজি লেখা ও বলাঃ ইংরেজি তো কেবল টোফেল এর জন্য লাগবে না। পরে এসে ইংলিশে পেপার লিখতে হবে একের পর এক। এই স্কিল খুব জরুরি।

৬) জিআরই এবং টোফেল বা আইএলটিএসঃ যে সেমিস্টারে আসতে চান, তার অন্তত এক বছর আগে এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে ফেলতে হবে। ইকনমিক্সে ফান্ডিং এর ডিসিশন সেন্ট্রালি হয়, সুতরাং প্রফেসরদের কাছে ইমেইল করে লাভ নেই।

৭) ফাইন্যান্সিয়ালিঃ এই পুরো প্রস্তুতির খরচ সব মিলিয়ে প্রায় ৪/৫ লাখ বা তার বেশী পড়ে যেতে পারে।

৮) মাস্টার্স নাকি পিএইচডিঃ আপনি দেশে মাস্টার্স করবেন নাকি বাইরে করবেন, নাকি দেশে মাস্টার্স করেও আবার বাইরে মাস্টার্স করবেন পিএইচডি করার আগে - এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এবার আমি কিছু রিসোর্স দিয়ে দিচ্ছি যা সাহায্য করতে পারে প্রস্তুতি নিতে।

ম্যাথের জন্যঃ মূলত ম্যাথের জন্য সাইমন এন্ড ব্লুম এর "ম্যাথেমেটিক্স ফর ইকনমিস্টস" বইটি ফলো করা হয়। বইটা কঠিন, এর জন্য আরও কিছু সহজ রিয়েল এনালাইসিস লেকচার দেখা যেতে পারে। এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাহায্য করতে পারেঃ https://www.youtube.com/watch?v=a20OW3hl1ow

মাইক্রোইকনমিক্সঃ মাইক্রো থিওরি এর জন্য মূলত লাগে ম্যাথের রিয়েল এনালাইসিস ব্যাকগ্রাউন্ড। বই হিসেবে MWG (Microeconomic Theory) এবং Jehle and Reny (Advanced Microeconomic Theory) বই দুটো ফলো করা হয়। এই বই এ যাওয়ার আগে অবশ্যই Varian এর Advanced বইটি দেখা উচিত। মূল কথা হোলো এই বই এর অনুশীলনী এর মত প্রশ্ন আসবে বাইরের পরীক্ষাগুলোতে। সেই স্কিল ধীরে ধীরে তৈরি করতে হবে।

ম্যাক্রোইকনমিক্সঃ ম্যাক্রোইকনমিক্স এর জন্য মূলত লাগে অপটিমাইজেশন / ক্যালকুলাসের স্কিল। বই হিসেবে ফলো করা হয় David Romer এর Advanced Macroeconomic Theory. Thomas Sargent এর Macroeconomic Theory ম্যাথেমেটিক্যালি আরও স্ট্রং এবং অনেক স্কুলে শুধু এটিই ব্যাবহার করা হয়।

ইকনমেট্রিক্সঃ ইকনমেট্রিক্স এর জন্য মূলত লাগে প্রবাবিলিটি এবং লিনিয়ার এলজেব্রা। এর জন্য মূলত Wooldridge এর Cross Section and Panel Data এবং Greene এর Econometric Analysis বইগুলো ব্যবহার করা হয়। মোটামুটি সবজায়গাতেই প্রফেসররা নিজেদের লেকচার তৈরি করে দেন, কারণ এইসব বই সব ডিটেইলসে পড়া সম্ভব না। এর বাইরে নিজের প্রজেক্ট এর জন্য Mostly Harmless, Mastering Econometrics, Mixtape এই বইগুলো রিগ্রেশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং ডাটা এনালাইসিসের ভালো বই।

ফিল্ড কোর্সের জন্য আগে থেকে তেমন বই দেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার খুব পছন্দের একটি বই হোলোঃ Debraj Roy এর ডেভেলপমেন্ট ইকনমিকস। মেইন্সট্রিম ইকনমিক্সের মার্কেট ধারণার অনেক কিছুই ডেভেলপিং কান্ট্রি এ খাটে না, এই বই সেইসব ধারণা থিওরি দিয়ে ভালো বোঝায় সাহায্য করে। ভালো জার্নালগুলো এর কারেন্ট পাবলিকেশন দেখলে এখন ইকনমিকস কোন দিকে যাচ্ছে, কিছুটা বুঝতে পারবেন।

ষষ্ঠ এবং শেষ পর্বঃ এপ্লিকেশন প্যাকেজ প্রস্তুত

আগের পর্ব থেকে আপনাদের মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে কি কি প্রস্তুতি নেওয়া লাগবে আন্ডারগ্র্যাডের কয়েক বছর। এখন আসা যাক, কি কি ডকুমেন্ট লাগবে আপনার নর্থ আমেরিকার কোনও স্কুলে ইকনমিক্সে এডমিশন পেতে। আমেরিকায় ইকনমিক্সে মাস্টার্সের জন্য ফান্ডিং ভালো সকুল থেকে পাওয়া কঠিন। তাই পিএইচডি এর আগে মাস্টার্স করতে চাইলে এটা মাথায় রাখতে হবে। আমি নিজে এই কারণ মাথায় রেখেই কানাডাতে মাস্টার্সের জন্য এপ্লাই করেছিলাম। আমেরিকা সরাসরি পিএইচডিতে ফান্ডিং দেওয়া প্রেফার করে ইকনমিক্সে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্সের অনেক সাবজেক্টের সাথে ইকনমিক্সের পার্থক্য হোলো আপনাকে সরাসরি ডিপার্টমেন্টে এপ্লাই করতে হবে। ডিপার্টমেন্ট সেন্ট্রালি ফান্ডিং এর সিদ্ধান্তগুলো নেবে। কোনও প্রফেসরকে ইমেইল করার দরকার নেই।

যে যে ডকুমেন্টগুলো লাগবে -

১) ট্রান্সক্রিপ্ট ঃ আন্ডারগ্র্যাজুয়েশনের ট্রান্সক্রিপ্ট। দেশে কনভার্ট করা লাগতে পারে ইন্টারন্যাশনাল স্কেলে। আপনার প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন অফিসের সাথে এনিয়ে কথা বলতে হবে।

২) সিভিঃ সিভি বা রেজুমে আসলে আন্ডারগ্র্যাডের শুরু থেকেই তৈরি করে রাখা ভালো। বাইরে এপ্লাই করতে সিভি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাট ব্যবহার করুন। আমার "একাডেমিক ব্লগ" ট্যাবে একটা টেম্পলেট দেওয়া আছে। এমন অনেক টেম্পলেট পাবেন, তা নিয়ে নিজের সুবিধামত কাজ করুন। ওয়ার্ড বা লেটেক্সে লিখতে পারেন। সিভিতে আপনার একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের নাম থাকতে হবে, আপনার রেফারেন্স রাইটারদের নাম থাকতে হবে, যদি ইন্টার্নশিপ বা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকে, তা লিখতে হবে। আপনার যদি কোনও অর্গানাইজিং এক্সপেরিয়েন্স থাকে, তা সিভিতে লিখলে ভালো। আপনি যদি কোনও পাবলিকেশনের সাথে জড়িত থাকেন, সেটাও উল্লেখ করুন। মোটামুটিভাবে, বিক্রয়যোগ্য সব কথাই সিভিতে তুলে দিন। মিথ্যা কথা লিখবেন না।

৩) জিআরই - টোফেলের রেজাল্টঃ ইটিএস থেকে আপনার রেজাল্ট আপনার নির্ধারিত স্কুলে পাঠিয়ে দেবে। পরীক্ষা দেওয়ার সময় কয়েকটি স্কুলের নাম সাথে করে নিয়ে যাবেন, এগুলোতে ডাইরেক্ট পাঠিয়ে দিতে পারবেন।

৪) রেকমেন্ডেশন লেটারঃ আপনাকে ভালো চেনে এবং আপনার সম্বন্ধে ভালো কথা লিখতে পারেন, এমন কয়েকজন প্রফেসরদের কাছে থেকে লেটার নিন। বাংলাদেশে অনেক জায়গায় লেটার নিয়ে অনেক পলিটিক্স চলে। এই ব্যাপারে প্রথম থেকে সাবধান থাকুন। আপনার লেটার রাইটার কি লিখছেন এটাই বড় কথা, উনি কোথা থেকে পিএইচডি করেছেন, এটা বড় কথা না। লেটার রাইটারকে সবসময় আপডেটেড রাখুন।

৫) Statement of Purpose (SOP): সকুলগুলো আপনার কাছে একটা স্টেটমেন্ট চাইবে। ২/৩ পৃষ্ঠার একটা essay লিখতে হবে যেখানে আপনি বলবেন আপনার রিসার্চ আইডিয়ার কথা, আপনার এক্সপেরিয়েন্স এর কথা এবং কেন এই পার্টিকুলার স্কুলে আপনি ভালো fit, সেটা। এখানে কোনও গল্পের দরকার নেই (যেমন, আমি জন্ম থেকে অর্থনীতি পড়তে চাই ইত্যাদি)। আপনার স্টেটমেন্ট পড়তে ওরা কয়েক মিনিটের বেশী সময় নেবে না। সুতরাং, শার্প লিখুন, টু দ্য পয়েন্ট লেখার চেষ্টা করুন।

৬) পাবলিকেশন বা রাইটিং স্যাম্পলঃ কিছু থাকলে ভালো। না থাকলেও সমস্যা নেই, এটা কমপালসরি না।

এই ডকুমেন্টগুলো একত্রে স্কুলকে পাঠাতে হবে। সকুল সিলেকশন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। এইক্ষেত্রে আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট, জিআরই এর স্কোর, সিজিপিএ এর ভূমিকা থাকবে খুব বেশী। আমি মাস্টার্সের সময় ৮ টি এবং পিএইচডি এর সময় ১১/১২ টি স্কুলে এপ্লাই করেছিলাম। সকুল সম্বন্ধে ভালো করে জেনে এপ্লাই করলে ফান্ডিং এর সুযোগ বেশি থাকবে। আপনার রেকমেন্ডেশন রাইটারদের সাহায্য নিতে পারেন সকুল সিলেকশনে। এই স্টেপটি আগে থেকেই ভাবা শুরু করুন - কোথায় এপ্লাই করবেন, কেন ওইখানে এপ্লাই করবেন, করলে কি কি বিষয়ে রিসার্চ করতে পারবেন। ফান্ডিং পাওয়া বা বাইরে যাওয়াটা আপনার শর্ট টার্ম

টার্গেট, লং টার্মে আপনি এমন একটা স্কুলে যেতে চান, যেখানে আপনি শিখতে পারবেন, রিসার্চ এঞ্জয় করতে পারবেন, যে সকুল আপনাকে পরবর্তী ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে।